

31 সেরা ছাত্র



পাণ্ডব ও কৌরবরা যুদ্ধবিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। দ্রোণাচার্য ছিলেন তাদের শিক্ষক।

সেই সময়ে যুদ্ধবিদ্যার মধ্যে ধনুর্বিদ্যাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা হতো। পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন ছিলেন সেরা ধনুর্ধর।

অর্জুন এই বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনুশীলন করতেন। এর ফলে তিনি বাকি সবার চেয়ে নিজেকে অনেক উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন দ্রোণের সেরা ছাত্র।



অর্জুনের এই একাগ্রতা দ্রোণের হৃদয়ে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি অন্যদের থেকে আলাদা করে অর্জুনকে বিশেষ শিক্ষা দিতেন।

কৌরব ভাইয়েরা বিষয়টি মোটেও পছন্দ করত না! তারা ঈর্ষার দৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে থাকত।

একদিন দ্রোণ তাঁর ছাত্রদের পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি একটি গাছের উঁচু ডালে কাঠের তৈরি একটি লক্ষ্যবস্তু ঝুলিয়ে দিলেন। লক্ষ্যবস্তুটি এমনভাবে তৈরি ও রঙ করা হয়েছিল, যাতে দেখতে ঠিক একটি পাখির মতো মনে হয়।

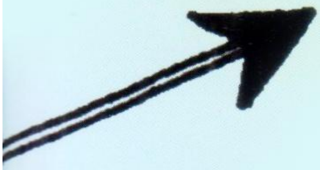


"ছাত্ররা!" দ্রোণ তাদের নিজের কাছে ডেকে বললেন।



সবাই সমবেত হলে তিনি বললেন, "ওই কাঠের পাখিটির দিকে তাকাও। ওটাই তোমাদের লক্ষ্যবস্তু। ওটিকে খুব মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করো এবং নিখুঁতভাবে তোমাদের লক্ষ্য স্থির করো! তোমাদের তীরটি যেন ঠিক পাখিটির চোখের মাঝখানে বিদ্ধ হয়।"





পাণ্ডব ও কৌরবরা ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথমে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে ডাকলেন।

যুধিষ্ঠির লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিশানা করলেন। তিনি তাঁর তীরটি প্রস্তুত করে নিলেন। হঠাৎই দ্রোণের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণভাবে শোনা গেল—"যুধিষ্ঠির!"

বালকটি অপেক্ষা করল। প্রশ্ন এল—"তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?"

"হে গুরু!" যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আমি গাছটি দেখতে পাচ্ছি। আমি গাছের পাতাগুলো দেখতে পাচ্ছি। আমি পাখিটিকেও দেখতে পাচ্ছি," তিনি বললেন।

"একপাশে সরে দাঁড়াও, যুধিষ্ঠির!" দ্রোণ বললেন। "লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার মতো যথেষ্ট স্পষ্টভাবে তুমি ওটিকে দেখতে পাচ্ছ না। তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।"

এরপর এল দুর্যোধনের পালা। দ্রোণ তাকেও একই প্রশ্ন করলেন। দুর্যোধন বলল, "হে গুরু! আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আর আমি অন্য ছাত্রদেরও দেখতে পাচ্ছি! তাছাড়া আমি গাছপালা, ডালপালা আর পাতাগুলোও দেখতে পাচ্ছি! আর আমি পাখিটিকেও দেখতে পাচ্ছি!" "আমার চোখে কত কিছুই না ধরা পড়ছে!" সে গর্বের সাথে বলল।



"তোমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, দুর্যোধন!" উত্তর এল।

ভীম, নকুল, সহদেব এবং অন্যদের পালাও একইভাবে কেটে গেল।

অবশেষে, অর্জুনের পালা এল। সে তার তীর প্রস্তুত করল। সে আর সবকিছু ভুলে গেল। এমনকি সে নিজের কথাও ভুলে গেল। সে কাঠের পাখিটির ওপর পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করল।

দ্রোণ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুন, তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?"

"পাখিটির চোখ, হে গুরু," অর্জুন বলল। "আমি কেবল ওটাই দেখতে পাচ্ছি।"

দ্রোণ বুঝতে পারলেন যে, অর্জুন তার লক্ষ্যের ওপর পুরোপুরি একাগ্রচিত্ত। তাই তিনি তাকে বললেন, "তোমার তীর নিক্ষেপ করো।"

অর্জুন তার তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি সোজা ও নির্ভুলভাবে ছুটে গেল। সেটি পাখিটির চোখ বিদ্ধ করল।

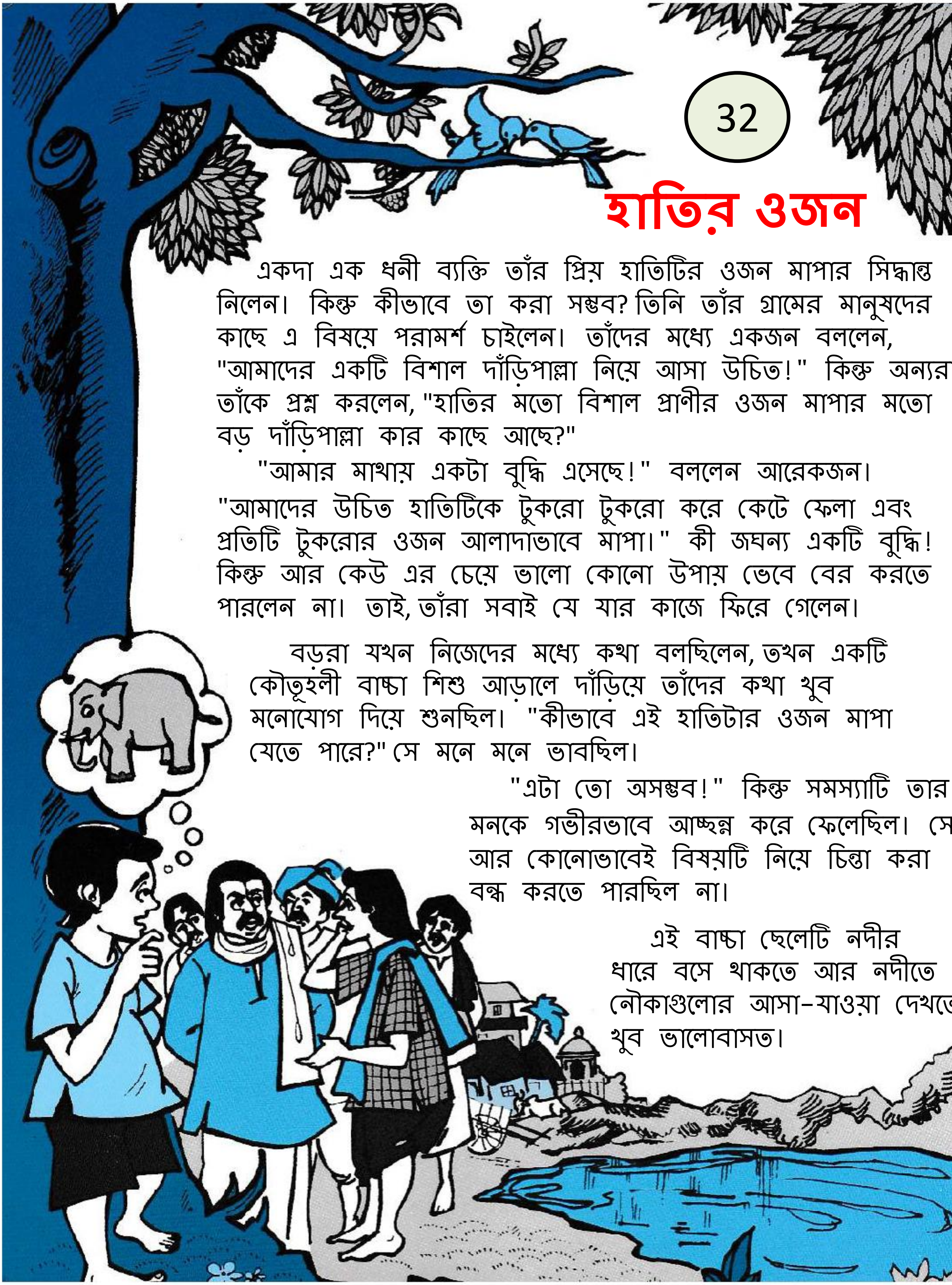
Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy



হাতির ওজন

একদা এক ধনী ব্যক্তি তাঁর প্রিয় হাতিটির ওজন মাপার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কীভাবে তা করা সম্ভব? তিনি তাঁর গ্রামের মানুষদের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "আমাদের একটি বিশাল দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসা উচিত!" কিন্তু অন্যরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "হাতির মতো বিশাল প্রাণীর ওজন মাপার মতো বড় দাঁড়িপাল্লা কার কাছে আছে?"

"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!" বললেন আরেকজন। "আমাদের উচিত হাতিটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা এবং প্রতিটি টুকরোর ওজন আলাদাভাবে মাপা।" কী জঘন্য একটি বুদ্ধি! কিন্তু আর কেউ এর চেয়ে ভালো কোনো উপায় ভেবে বের করতে পারলেন না। তাই, তাঁরা সবাই যে যার কাজে ফিরে গেলেন।

বড়রা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, তখন একটি কৌতূহলী বাচ্চা শিশু আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। "কীভাবে এই হাতিটার ওজন মাপা যেতে পারে?" সে মনে মনে ভাবছিল।

"এটা তো অসম্ভব!" কিন্তু সমস্যাটি তার মনকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সে আর কোনোভাবেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করতে পারছিল না।

এই বাচ্চা ছেলেটি নদীর ধারে বসে থাকতে আর নদীতে নৌকাগুলোর আসা-যাওয়া দেখতে খুব ভালোবাসত।

একদিন সে লক্ষ্য করল, একটি নৌকা জলের বেশ গভীরে ডুবে আছে। ঢেউগুলো নৌকার দুপাশ দিয়ে প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছিল।

হঠাৎই ছেলেটি লাফ দিয়ে উঠল এবং দৌড়ে সেই ধনী ব্যক্তির বাড়িতে গেল। "আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারব আপনার হাতিটির ওজন ঠিক কতটুকু!" সে ধনী ব্যক্তিকে বলল। এরপর সে তাঁকে হাতিটিকে নিয়ে নদীর তীরে আসার অনুরোধ করল।

গ্রামের সব মানুষও এসে সেখানে জড়ো হলো। ছেলেটি এবার নির্দেশ দিতে শুরু করল। "আমাদের একটি মজবুত নৌকা প্রয়োজন!" সে বলল। একটি নৌকা নিয়ে আসা হলো। "এবার, হাতিটাকে নৌকার ভেতরে উঠতে দিন!"

হাতিটা নৌকায় ওঠার সাথে সাথেই নৌকাটি জলের আরও গভীরে নেমে গেল।



ছেলেটি বাড়ি থেকে সঙ্গে করে আনা একটি দাগ কাটার যন্ত্র বের করল। সে নৌকার গায়ে ঠিক সেই জায়গাটিতে একটি রেখা টেনে দিল, যেখানে জলের উপরিতল নৌকাটিকে স্পর্শ করে ছিল। "এবার, হাতিটিকে নৌকা থেকে নামিয়ে আনুন!" সে নির্দেশ দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই হাতিটি নিরাপদে নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। আর নৌকাটি জলের ওপরের দিকে উঠে এল! নৌকার গায়ে আঁকা রেখাটি এখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল!

"এবার নৌকাটিতে কিছু পাথর বোঝাই করা হোক!"— এটিই ছিল তার পরবর্তী নির্দেশ।





"ততক্ষণ পর্যন্ত পাথর বোঝাই করতে থাকুন, যতক্ষণ না নৌকাটি আবার আগের অবস্থানে নেমে আসে! নৌকার গায়ে আঁকা রেখাটি যেন পুনরায় জলের উপরিতলকে স্পর্শ করে!"

"থামুন!"—রেখাটি জলের স্তর স্পর্শ করার সাথে সাথেই ছেলেটি বলে উঠল। "এখন নৌকায় থাকা সব পাথরের মোট ওজন ঠিক হাতির ওজনের সমান!"

গ্রামবাসীরা হাততালি দিয়ে উঠল। "কী বুদ্ধিমান ছেলে!" তারা একে অপরের সাথে বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু ঠিক তখনই ছেলেটি চেঁচিয়ে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিল: "আমরা কি পাথরগুলোর মোট ওজন বের করে দেখব?"

মুহূর্তের মধ্যেই লোকজন তাদের দাঁড়িপাল্লাগুলো আনতে নিজেদের বাড়ির দিকে ছুটে গেল। নৌকা থেকে পাথরগুলো একে একে বের করে আনা হলো। পাথরের ওজনগুলো যখন বলা হচ্ছিল, গ্রামের ছেলেমেয়েরা তখন সেগুলো লিখে নিচ্ছিল।

অবশেষে শেষ পাথরটির ওজন মাপা হলো। সব পাথরের ওজন একত্র করে যোগ করা হলো। সব হিসাব-নিকাশ দুবার করে যাচাই করে নেওয়া হলো। তারপর ছেলেটি মোট ওজনটি পড়ে শোনাল।

আর সেই ধনী লোকটি আনন্দে হেসে উঠল! কারণ, সেটাই ছিল হাতির আসল ওজন।

একটি ঐতিহ্যবাহী চীনা লোককথা



© Katha Jharna 2008

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

একটি অত্যন্ত দীর্ঘ গল্প

একদা এক রাজা ছিলেন, যিনি সব ধরণের গল্প শুনতে ভালোবাসতেন। যখনই তিনি অবসর পেতেন, তিনি তাঁর রাজকর্মচারীদের কাউকে—সে মন্ত্রী হোক, সেনাপতি হোক, প্রহরী হোক, এমনকি মালী হোক—ডেকে পাঠাতেন এবং তাঁদের প্রিয় কোনো গল্প শোনাতে বলতেন। গল্প শোনার যে তাঁর তৃষ্ণা, তা কখনোই মিটত না।

একদিন তিনি আরও বেশি মানুষের গল্প শোনার একটি উপায় ভেবে বের করলেন। "আমি একটি গল্প বলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করব!" তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাজ্যের সব প্রান্তে একটি ঘোষণা করা হলো: "যে গল্পকথক সবচেয়ে দীর্ঘ গল্পটি শোনাতে পারবেন, রাজা তাঁকে ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেবেন!"

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দূর-দূরান্ত থেকে গল্পকথকরা এসে জড়ো হলেন। আর তাঁদের গল্পগুলো ছিল সত্যিই দীর্ঘ! একজনের গল্প শেষ করতে পুরো এক সপ্তাহ সময় লেগে গেল। আরেকজনের লাগল দশ দিন। এমনকি অন্য একজনের গল্প তো টানা এক মাস ধরে চলল! কিন্তু রাজা সব গল্পকথককে উদ্দেশ্য করে কেবল একটাই কথা বলতেন, "তোমাদের গল্পটা খুব একটা দীর্ঘ নয়।" আর এই বলে তিনি তাঁদের বিদায় করে দিতেন।

গল্পকথকরা আসতেই থাকলেন। আর রাজা তাঁদের বিদায় করতেই থাকলেন। এভাবেই মাসের পর মাস কেটে গেল, যতক্ষণ না...

একদিন এক চতুর কবি রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন। "আমাকে ওই ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা জিততেই হবে!" তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন।

রাজার সামনে উপস্থিত হওয়ার পালা যখন এল, তখন তিনি রাজাকে বললেন, "মহারাজ, আমি এমন একটি অত্যন্ত দীর্ঘ গল্প জানি, যা পুরোপুরি বলে শেষ করতে আমার সারাটি জীবন কেটে যাবে!"

"চমৎকার!" রাজা বলে উঠলেন। "তবে আর দেরি কেন? শুরু করো!"



"বেশ," কবি বললেন। "তবে আপনাকে একটি শর্তে রাজি হতে হবে।"

"বলো, কী সেই শর্ত," রাজা জানতে চাইলেন।

"গল্প শোনার সময় আপনাকে মাঝে মাঝে বলতে হবে—'তারপর কী হলো? তারপর কী হলো?'" কবি জানালেন।

"এটুকুই তো?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন। ব্যস, কবি তাঁর গল্প শুরু করলেন:

একদা এক অত্যন্ত বিত্তশালী ও সমৃদ্ধশালী রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের ধানের ক্ষেতগুলো ছিল দিগন্ত বিস্তৃত। রাজ্যের প্রজাদের কখনোই অনাহারে দিন কাটাতে হতো না। তারা কঠোর পরিশ্রম করত এবং সুখে-শান্তিতে দিন কাটাত।

একবার এমন একটি ঋতু এল, যখন ধানের ফলন হলো অভূতপূর্ব—যা আগে কখনো দেখা যায়নি। ফসল উঠল বিপুল পরিমাণে! রাজ্যের সর্বত্র সদ্য ঝাড়াই করা ধানের স্তূপ জমে গেল।

রাজার এক মন্ত্রী পরামর্শ দিলেন, "চলুন মহারাজ, আমরা একটি বিশাল শস্যাগার নির্মাণ করি। আমাদের উদ্বৃত্ত শস্যের সবটুকু সেখানে সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। তাতে করে, ভবিষ্যতে যদি কখনো আমাদের ফসলের ফলন ভালো নাও হয়, তবুও আমরা প্রজাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারব।" রাজা মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। নতুন শস্যাগারটি নির্মাণের কাজে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছিল। যখন এর নির্মাণকাজ শেষ হলো, তখন সারা পৃথিবীতে এর জুড়ি মেলা ভার ছিল! দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এটি দেখতে আসত। এটি যে কেবল বিশাল আকৃতির ছিল তাই নয়; এটি শস্যে কানায় কানায় পূর্ণও ছিল।

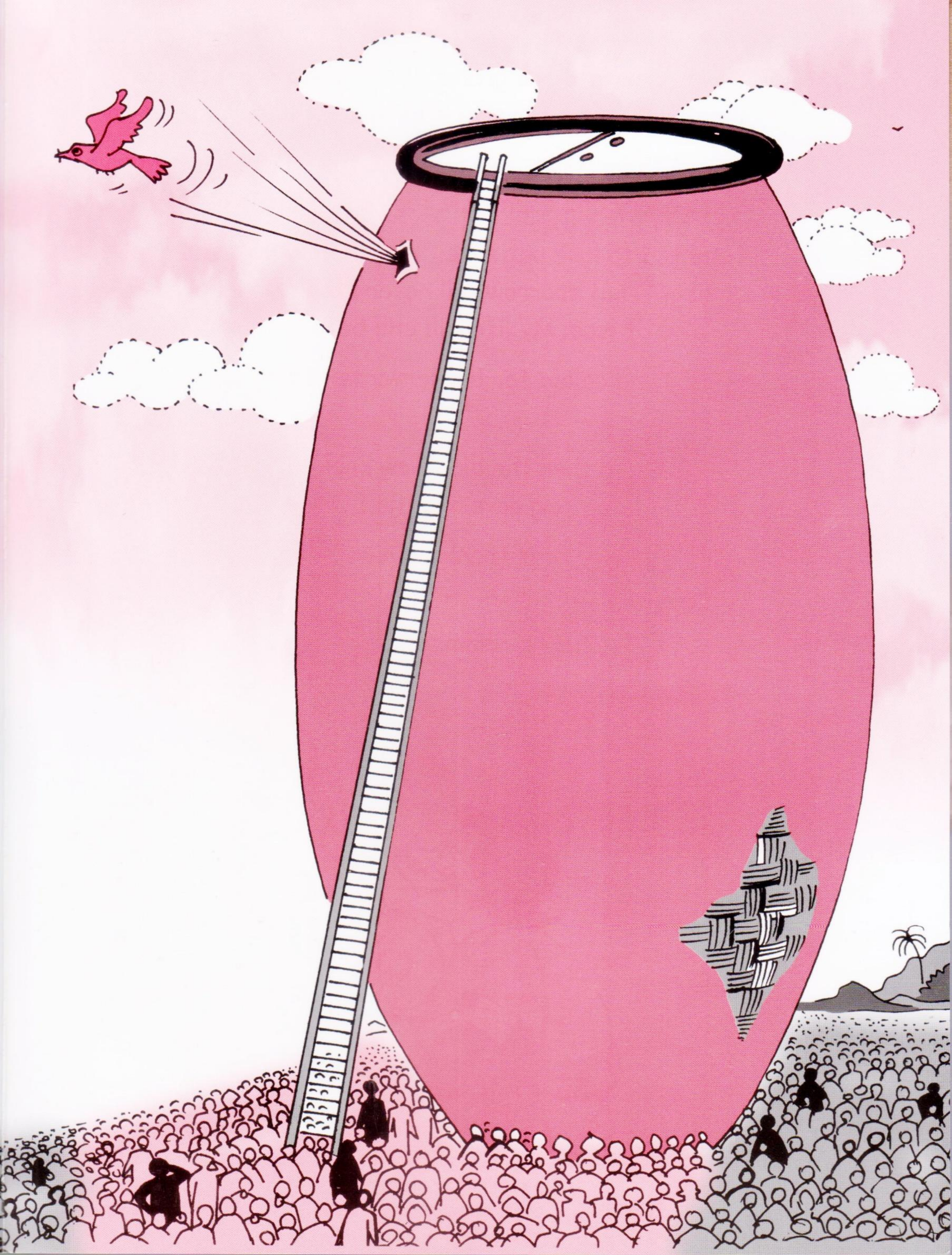
শস্যাগারের দেয়ালের বেশ উঁচুতে বাতাস চলাচলের জন্য একটি ছোট ছিদ্র রাখা হয়েছিল। একদিন একটি চড়ুই পাখি সেই ছিদ্রটি দেখতে পেল। সে উড়ে ভেতরে ঢুকল এবং ঠোঁটে করে একটি ধানের দানা তুলে নিল। তারপর সে সেই দানাটি নিয়ে তার বাসায় ফিরে গেল...

কবি ক্ষণিকের জন্য থামলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

"চড়ুইটি আবার শস্যাগারের ভেতরে উড়ে গেল এবং—সোঁওওওও—আবারও ঠোঁটে একটি ধানের দানা নিয়ে বেরিয়ে এল। সে এই দানাটিও তার বাসায় রেখে এল..."

কবি আবারও থামলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"





"আবারও চড়ুইটি শস্যাগারের ভেতরে উড়ে গেল এবং ঠোঁটে একটি ধানের দানা তুলে নিল। সোঁওওওও! আবারও সে উড়ে তার বাসায় ফিরে গেল..."

কবি তার গল্প বলে চললেন। তিনি বর্ণনা করলেন, কীভাবে চড়ুইটি বারবার শস্যাগারে যাচ্ছিল এবং প্রতিবারই সেখান থেকে একটি করে ধানের দানা বের করে আনছিল।

শীঘ্রই রাজার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করল। "তারপর? তারপর কী হলো?" তিনি বলে উঠলেন। কিন্তু মনে মনে তিনি ভাবছিলেন, "ওই চড়ুইটা তো ধানের দানা নিয়ে এভাবে আসা-যাওয়া করা কখনোই থামাবে না। এই গল্প শেষ হওয়ার আগেই তো আমার জীবনাবসান ঘটবে!"

তিনি নিজের কান চেপে ধরলেন এবং ভৃত্যদের ডাকলেন। "এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসো!" তিনি গর্জন করে উঠলেন।

কবি তখন বলছিলেন, "এরপর পাখিটি উড়ে তার বাসায় ফিরে গেল..." এই বলে তিনি থেমে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজা তাকে সেই এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করলেন।

কবি অত্যন্ত সুচারু ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় রাজাকে ধন্যবাদ জানাতে শুরু করলেন, কিন্তু রাজা তাকে থামিয়ে দিলেন।

"দূর হও এখান থেকে! দূর হ, দূর হ!" তিনি আদেশ দিলেন।

তাই, কবি আর একটিও কথা না বলে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন। আর রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ভারতের একটি লোককথা



P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

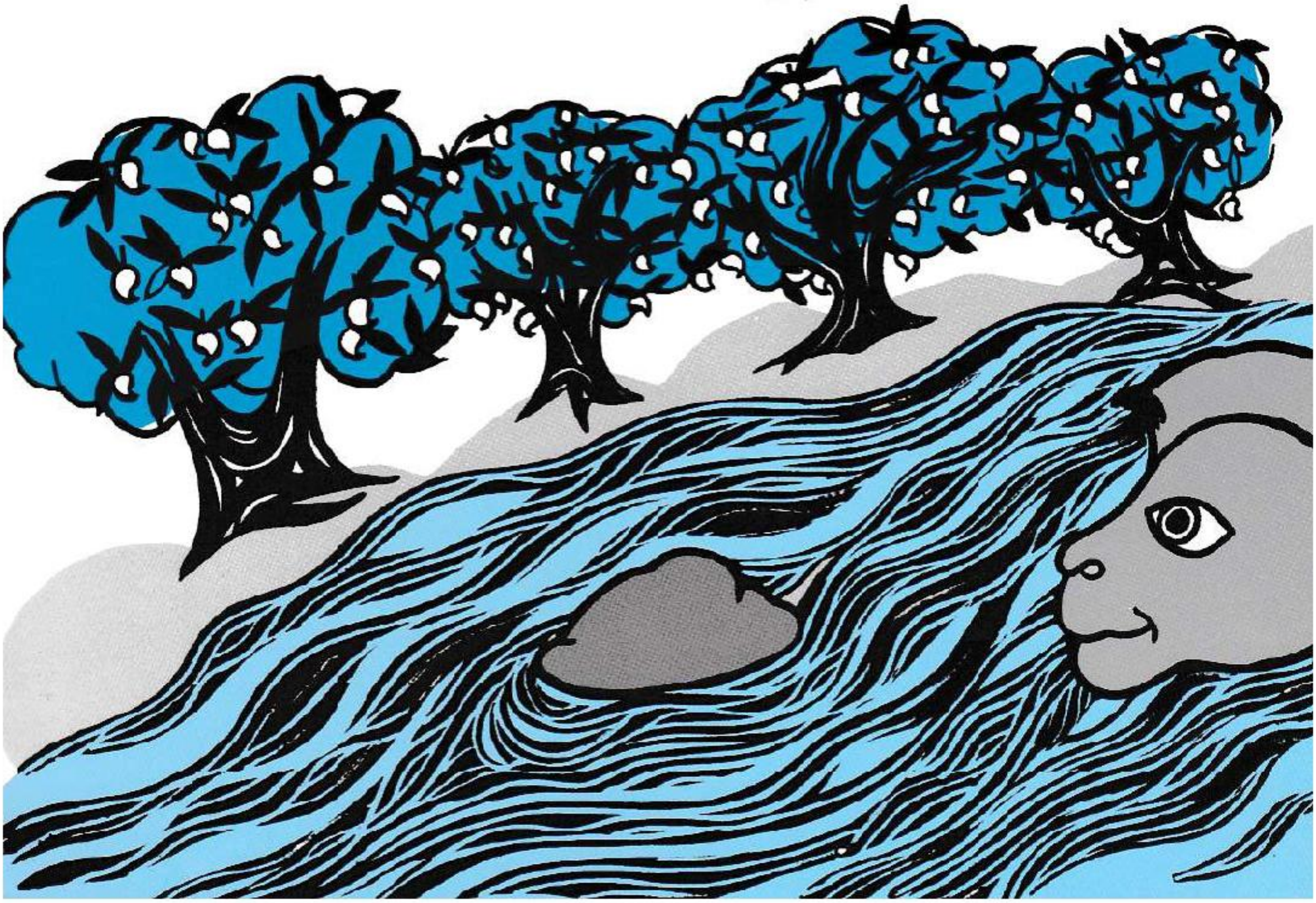
নন্দরিয়া ও কুমির

নন্দরিয়া—এক সাহসী ছোট্ট বানর—সে একা বুনো ও বিপদসংকুল অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালোবাসত।

একদিন সে এমন এক বিশাল নদীর দেখা পেল, যার ঠিক মাঝখানে ছিল একটি দ্বীপ। কী চমৎকার সেই দ্বীপ! দ্বীপটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছিল আমগাছে ভরা। আমগাছের পাতার আড়ালে লোভনীয় পাকা আমগুলো উঁকি দিচ্ছিল।

"ইশ, ওই আমগুলো যদি একবার চেখে দেখতে পারতাম!" মনে মনে ভাবল নন্দরিয়া। "কিন্তু নদীটা যে বড্ড চওড়া আর তার স্রোতও খুব তীব্র। আমি ওপারে যাব কী করে?"

হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, দ্বীপে যাওয়ার প্রায় মাঝপথে নদীর জলের ওপর একটি পাথরের চাঁই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আহা! ... এক বিশাল লাফে নন্দরিয়া সেই পাথরের ওপর গিয়ে পৌঁছাল। সেখান থেকে আরেকটি লাফ দিয়ে সে পৌঁছে গেল দ্বীপে। কী বিপদসংকুল এক পথ! তবে সাহসী ছোট্ট নন্দরিয়ার কাছে তা মোটেও ভীতিজনক ছিল না!



নন্দরিয়া একটি গাছে চড়ে একটি আম পেড়ে খেল। কী সুস্বাদু সেই আম! সে আরেকটি আম খেল। সেটির স্বাদ তো আরও চমৎকার! নন্দরিয়া মন ভরে আম খেল। তারপর সে লাফ দিয়ে আবার সেই পাথরের ওপর ফিরে এল এবং সেখান থেকে নদীর তীরে এসে পৌঁছাল। এরপর সে বাড়ি ফিরে গেল।

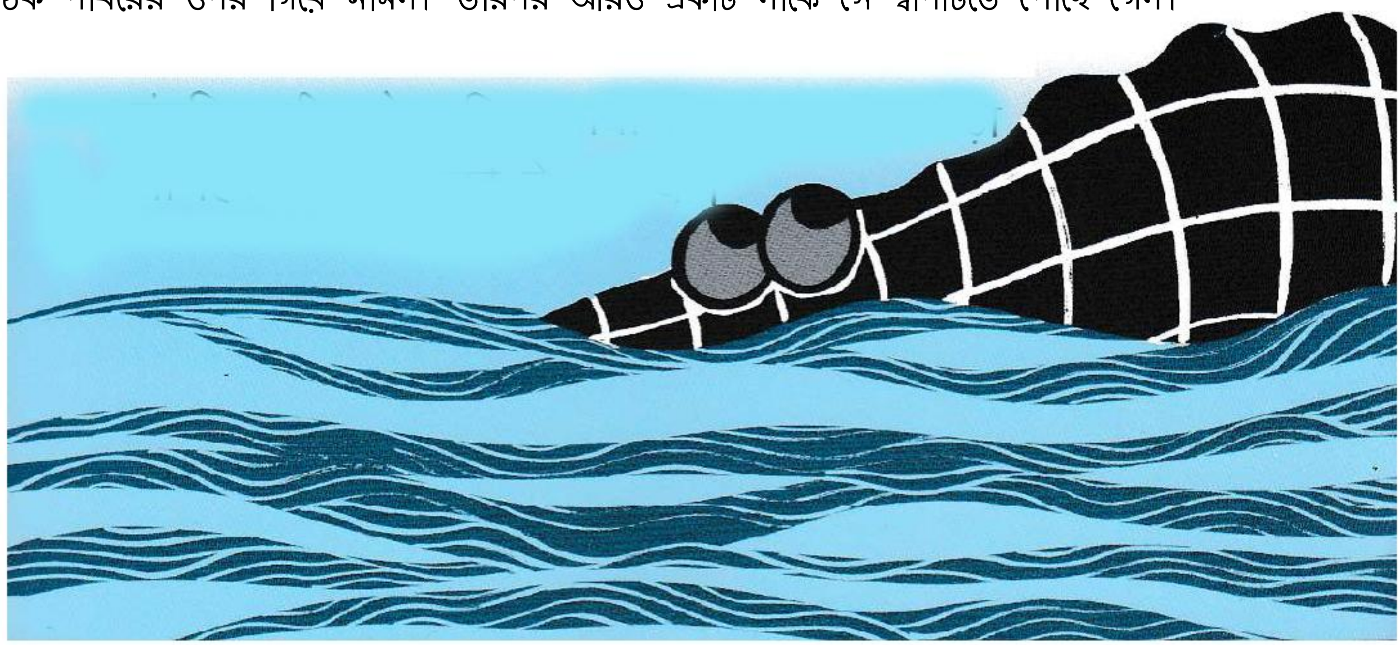
সে রাতে নন্দরিয়া তার বাবা-মাকে সেই দ্বীপটি এবং সেখানকার চমৎকার সব ফলের কথা সবিস্তারে শোনাল। "চলো আমার সাথে, তোমরাও গিয়ে আম খেয়ে এসো একদিন..." সে তাদের আমন্ত্রণ জানাল। "আমাদের হাতে একদম সময় নেই," তারা উত্তর দিল। নন্দরিয়ার বন্ধুরাও তার প্রস্তাবে রাজি হলো না। "ওই দ্বীপটা যে বড্ড বেশি দূরে," তারা বলল।

নন্দরিয়া তাদের কাউকেই রাজি করাতে পারল না। তাই যখনই সে দ্বীপে আম পাড়তে যেত, সে সব সময় একাই যেত। এতে কি তার মন খারাপ হতো? ভয় হত? একদমই না। এমন সাহসী ছোট্ট বানরের কাছে গভীর অরণ্যের কোনো ভয়ই ছিল না।

কিন্তু বিপদ যে ওত পেতে ছিল! একটি কুমির নন্দরিয়ার এই আসা-যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছিল। "ওহ! একটি ছোট্ট বানর একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে! কী চমৎকার এক ভোজ হবে!" কুমিরটি মনে মনে ভাবল। সে বানরটিকে খেয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। তার ধূর্ত মস্তিষ্কে একটি পরিকল্পনা দানা বেঁধে উঠল। সে নন্দরিয়ার আসার অপেক্ষায় রইল।

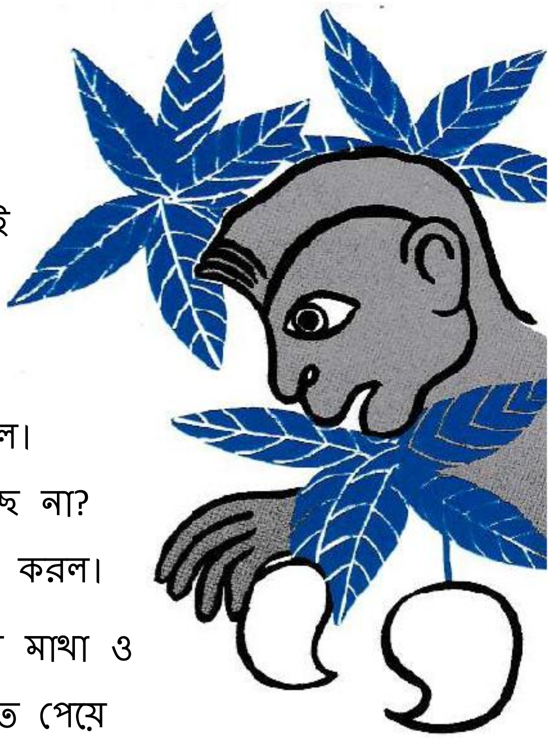
খারাপ আবহাওয়ার কারণে নন্দরিয়াকে কয়েক দিন বাড়িতেই থাকতে হলো। এরপর যখন সে আবার আম পাড়তে গেল, তখন এক বড়সড় ধাক্কা খেল! বৃষ্টির কারণে নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল! জলের উচ্চতা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, পাথরের চাঁইটির উপরিভাগ প্রায় জলের নিচেই তলিয়ে গিয়েছিল।

"আমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে," নন্দরিয়া মনে মনে ভাবল। "নইলে, এই তীব্র স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!" সে তার সমস্ত শক্তি এক করে এক বিশাল লাফ দিল। কী দারুণ সাফল্য! সে ঠিক পাথরের ওপর গিয়ে নামল। তারপর আরও একটি লাফে সে দ্বীপটিতে পৌঁছে গেল।



ফিরে আসতে পেরে সে কী যে রোমাঞ্চিত বোধ করছিল! সে খুব ধীরস্থিরভাবে ভোজ সারল। সে সবচেয়ে পাকা ফলগুলো বেছে নিল। প্রতিটি কামড়ের স্বাদ সে পরম তৃপ্তির সাথে উপভোগ করল।

আর এখন সময় হলো বাড়ি ফেরার। নন্দরিয়া পাথরের ওপর লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু একি! পাথরটি যেন অন্যরকম মনে হলো! সে খুব সতর্কতার সাথে পাথরটি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করল। হুমম... সে যখন এসেছিল, তার চেয়ে পাথরটি এখন অনেক বড় দেখাচ্ছে। ফুলে-ফেঁপে ওঠা নদীর জলরাশির ওপর এটি এখন অনেক উঁচুতে উঠে আছে। "কেউ নিশ্চয়ই আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছে!" সে বুঝতে পারল। কিন্তু কে? সে তা জানার চেষ্টা করল।



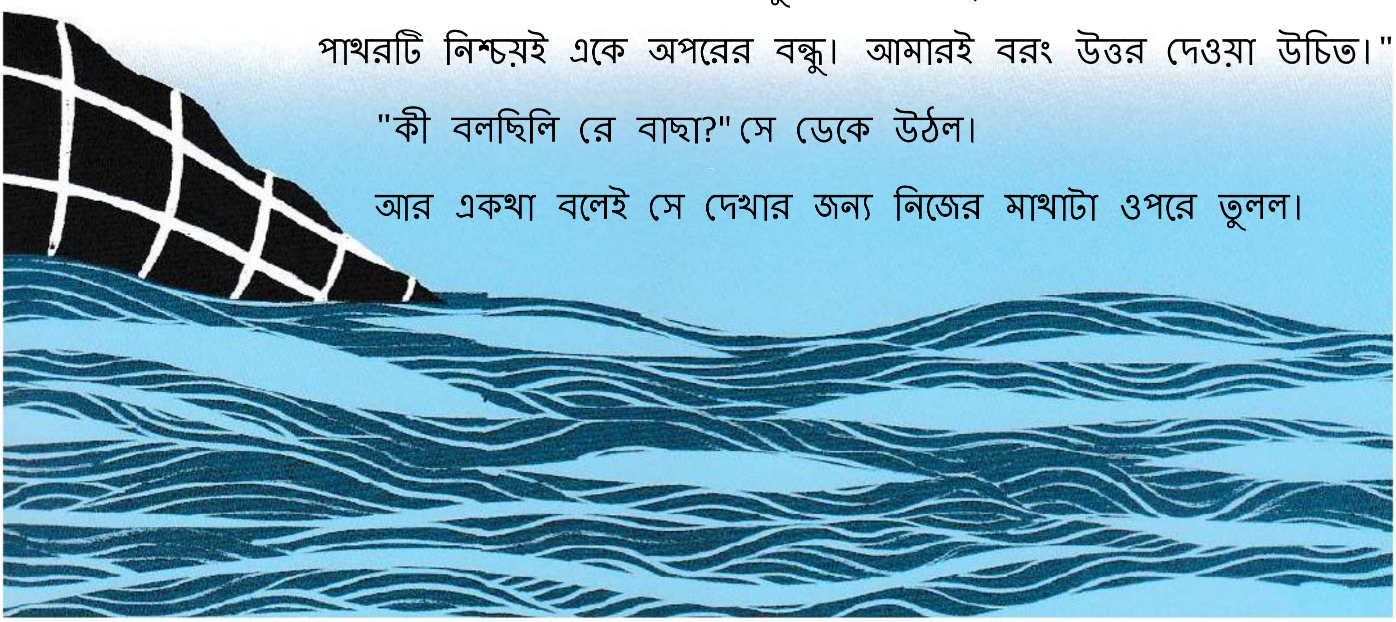
"ভাই পাথর! আজ তোমার কী খবর?" সে ডেকে উঠল। কোনো উত্তর এল না। "তুমি কেন আমার সাথে কথা বলছ না? আমাদের বন্ধুত্ব কি তবে শেষ হয়ে গেল, ভাই?" সে জিজ্ঞেস করল।

কুমিরটি পাথরের ওপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে ছিল; তার মাথা ও লেজ ছিল জলের নিচে। নন্দরিয়ার ডাক অস্পষ্টভাবে শুনতে পেয়ে সে তার মাথাটা সামান্য একটু ওপরে তুলল। এবার সে নন্দরিয়ার ডাক স্পষ্টভাবে শুনতে পেল: "ভাই পাথর, ভাই পাথর!"

লোভের বশে নির্বোধ হয়ে কুমিরটি ভাবল, "ওহ! এই বানর আর পাথরটি নিশ্চয়ই একে অপরের বন্ধু। আমারই বরং উত্তর দেওয়া উচিত।"

"কী বলছিলি রে বাছা?" সে ডেকে উঠল।

আর একথা বলেই সে দেখার জন্য নিজের মাথাটা ওপরে তুলল।



এবার নন্দরিয়া সব বুঝতে পারল। "নমস্কার, মিস্টার কুমির!" সে ডেকে উঠল। "আমি কি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি?" কুমিরটির ফন্দি ফাঁস হয়ে গিয়েছিল! সে ভীষণ রেগে গেল! "আমি তোকে খেয়েই ফেলব!" সে গর্জন করে উঠল।

"আমি কীভাবে পালাব?" নন্দরিয়া ভাবতে লাগল। কিন্তু সে তো ছিল নির্ভীক। সে চটজলদি চিন্তা করল এবং একটি ফন্দি আঁটল।

"ঠিক আছে, মিস্টার কুমির!" সে বলল। "আপনি আমাকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। আমি সোজা আপনার মুখের ভেতর লাফ দেব। দয়া করে আপনার মুখটা যতটা সম্ভব বড় করে হাঁ করুন। তবে চোখ দুটো বন্ধ রাখবেন, পাছে আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়।"

সেই নির্বোধ কুমিরটি তার চোখ বন্ধ করল এবং মুখটা বিশাল করে হাঁ করল। নন্দরিয়া লাফ দিল—ওপরে, আরও ওপরে, অনেক ওপরে—এবং কুমিরটির চোয়াল অনায়াসেই পার হয়ে গেল। সে গিয়ে পড়ল কুমিরটির পিঠের ঠিক মাঝখানে এবং সেখান থেকে এক লাফে নদীর তীরে গিয়ে উঠল।

"ওহ, মিস্টার কুমির! আপনি তো আমাকে ধরতেই পারলেন না!" সে হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠল এবং দৌড়ে বাড়ির পথে পা বাড়াল।

একটি জাতক কাহিনী



P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

35

চার বন্ধু



একদা একটি কচ্ছপ, একটি কাক, একটি ইঁদুর এবং একটি হরিণ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল। তারা প্রতিটি মুহূর্ত একে অপরের সাথে কাটাত; কেবল খাবারের সন্ধানে বের হওয়ার সময়টুকুতেই তারা আলাদা হতো। কাক, ইঁদুর এবং হরিণ খাবারের খোঁজে দূর-দূরান্তে ঘুরে বেড়াত, আর কচ্ছপটি তাদের বাসস্থানের কাছাকাছি ঝোপঝাড় ও ঘাস-লতাপাতার মধ্যেই খাবার খুঁজে নিত।

এক সন্ধ্যায় কাক, কচ্ছপ এবং ইঁদুর—এই তিনজন হরিণের জন্য অপেক্ষা করছিল; কারণ হরিণটি তখনো খাবার সংগ্রহ করে ফিরে আসেনি। "নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে!"—তিন বন্ধু দুশ্চিন্তা করতে লাগল।

কাকটি বলল, "আমি গিয়ে চারপাশটা একটু দেখে আসি।" এই বলে সে হরিণের খোঁজে উড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সে তার বন্ধুকে দেখতে পেল। কিন্তু পরিস্থিতিটা মোটেও স্বাভাবিক ছিল না!



ঘটনাটি কী তা দেখতে কাকটি নিচে নেমে এল। সর্বনাশ! বেচারা হরিণটি এক শিকারির জালে আটকা পড়েছিল! কাকটি দ্রুত অন্যদের কাছে ফিরে এল। সে তাদের সেই দুঃসংবাদটি জানাল।

"আমাদের হরিণকে উদ্ধার করতেই হবে!" ইঁদুরটি বলে উঠল। "আমি জালটা কেটে হরিণকে মুক্ত করে দেব!" সে লাফ দিয়ে কাকের পিঠে চড়ে বসল। কাকটি তাকে উড়িয়ে ঠিক সেই জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে হরিণটি আটকা পড়েছিল।

ইঁদুরটি মনোযোগ দিয়ে জালটি কাটতে লাগল এবং অবশেষে জালটি কেটে ফেলল। সে হরিণটিকে জালের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করল। ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে এসে হাজির হলো কচ্ছপটি!

"ওহ, সর্বনাশ! তুমি কেন আমাদের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এখানে চলে এলে?" ইঁদুরটি জিজ্ঞেস করল। "শিকারিরা যদি এখানে চলে আসে, তবে কাকটি উড়ে পালাবে, হরিণটি দৌড়ে পালাবে, আর আমি কোনো গর্তের ভেতর লুকিয়ে পড়ব। কিন্তু তুমি তো আটকা পড়ে যাবে।"

"হরিণ বিপদে পড়েছে জেনে আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না," কচ্ছপটি উত্তর দিল। "তাই আমাকে আসতেই হলো।"



তারা যখন কথা বলছিল, ঠিক তখনই একজন শিকারি সেখানে এসে উপস্থিত হলো। এক লাফে হরিণটি চোখের আড়াল হয়ে গেল। ইঁদুরটি কাছেই থাকা একটি গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ল। আর কাকটি উড়ে পালাল।

বেচারা কচ্ছপ! সে আটকা পড়ে গেল। শিকারি কিছু লম্বা ঘাস ছিঁড়ে এনে তা দিয়ে একটি দড়ি তৈরি করল। তারপর সে কচ্ছপটির চার পা একসঙ্গে বেঁধে ফেলল। সেই ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণীটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে বাড়ির পথে রওনা হলো। বন্ধুরা তাদের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে এল। হরিণটি বলল, "আমাদের কচ্ছপকে উদ্ধার করতেই হবে!"

ইঁদুরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। সে হরিণটিকে বলল, "তুমি এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে মরে পড়ে থাকার ভান করো। এমনভাবে পড়ে থাকবে যেন মনে হয় তুমি মারা গেছ।"



সে কাকটিকে বলল, "তুমি হরিণটির পিঠে গিয়ে বসো এবং এমন ভান করো যেন তাকে ঠোকর দিচ্ছ। শিকারি তোমাকে দেখতে পাবে এবং কচ্ছপটিকে নিচে নামিয়ে রাখবে। যখন সে তোমার কাছে এগিয়ে আসবে, তখন আমি দড়িটি কেটে কচ্ছপটিকে মুক্ত করে দেব।"

তারা সবাই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করল। শিকারি পথের ধারে হরিণটিকে শুয়ে থাকতে দেখল। একটি কাক তার শরীরে ঠোকর দিচ্ছিল। শিকারি কচ্ছপটিকে নিচে নামিয়ে রাখল এবং হরিণটির দিকে এগিয়ে গেল। তখন ইঁদুরটি দড়িটি কেটে কচ্ছপটিকে মুক্ত করে দিল। শিকারি যখন হরিণটির খুব কাছে পৌঁছাল, তখন সেটি লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে পালাল। কাকটিও উড়ে গেল। শিকারি বিস্ময়ের সাথে তাদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। আর যখন সে কচ্ছপটিকে তুলে নেওয়ার জন্য ফিরে তাকাল, দেখল সেটিও উধাও হয়ে গেছে!

পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

আমরা কারা?



স্বচ্ছ জলের বিন্দুকণায় শোভিত,
গোলাকার পাতাগুলো ভেসে থাকে শান্ত সমাহিত।
আর তাদের ঠিক ওপর, বলিষ্ঠ ডাঁটার আগায়,
নিখুঁত সব ফুল সে ফোটায়।

ফুলগুলো সব বিশাল আর নজরকাড়া,
তূর্য–আকৃতির, দারুন লাল রঙ।
মৃদু হাওয়ায় তারা দোলে,
তাদের থেকে উঁকি দেয় বাইরে সরু,লম্বা পুংকেশরেরা।

স্তরে স্তরে পাপড়িরা করে ঝলমল,
সোনালি হলুদ কিংবা গাঢ় কমলা।
একে একে গেঁথে তৈরী হয় মালা।
এরই সাজসজ্জায় হয়ে ওঠে আলো, উৎসবমুখর ঘরগুলো।

বিশাল, হলুদ আর মৌমাছির গুঞ্জনে মুখর—
সূর্যের পানে চেয়ে সারাদিন!
আমাদের দেয় বীজ—মৌমাছিরা যা করে পান—
তার থেকে বানায় মধু, সুমধুর!

ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হই আমরা
স্তরে স্তরে সাজানো পাপড়ি ধরি মেলে
ছড়াই আমাদের মিষ্টি সুবাস **যখন**,
কাঁটায় ভরা ডাঁটাগুলো আমাদের রক্ষা করে তখন।

হাসছে দেখো সাদা সাদা ফুল
গোছা গোছা, সব ডালে ডালে।
লতায় লতায় ফুটে থাকে ওরা,
কী সুবাসে মাতায় রাতের বাতাস তারা!

গোলাপ, জবা, গাঁদা, সূর্যমুখী, পদ্ম, জুঁই





তার আছে ডানা
তবু উড়তে সে পারে না
আছে তার পা মাত্র দুটি
তবু সে ছোটে যেন, ঘোড়াটি

হলুদ পা, হলুদ ঠোঁট
হলুদ বলয়— চোখের চারিপাশে
শিস দেয়, আর করে কিচিরমিচির
ডাকে কর্কশ স্বরে আর গর্জন করে প্রচুর
সে তোমার ডাকে সাড়া দেয়

অন্ধকারে শিকার ধরার সময় চিঁ চিঁ চেঁচায়
ভোরের আলোটি ফুটলে পরে, ফিরে আসে বাসায়
গোল গোল চোখ দুটি তার ঘুমে ঢলে যায়

মাথার ওপর একটি লাল ফুল— কে তা ছিঁড়ে নেবে?
পায়ের ওপর একটি হলুদ কাঁটা— কে তা সরিয়ে দেবে?
সকালে ঘুম ভাঙানোর ডাক—কে-ই বা তা এড়াতে পারে?
লড়াইয়ের ময়দানে এক দুর্ধর্ষ প্রতিযোগী—কে-ই বা তাকে হারাতে পারে?

আহ! আমার এই পাখা—
সহস্র উজ্জ্বল চোখ তার মেলে
রাজকীয় নৃত্যের তালে!
ঝিকিমিকি সবুজ আর নীল রঙের ছটায়
পালকগুলো সব দুলে কাঁপায়।



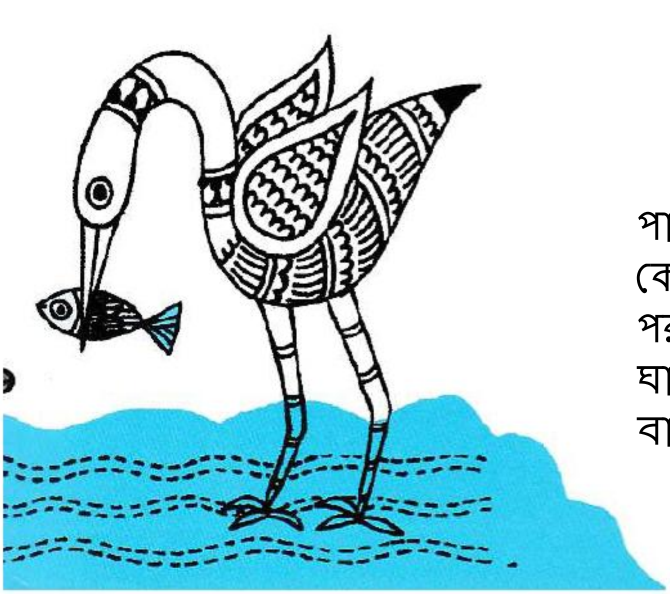


ওড়ার জন্য আমার আছে শক্তপোক্ত ডানা
হাঁটার জন্য আছে মজবুত পা
সাঁতার কাটার জন্য আছে শক্ত
পায়ে আঙ্গুল জোড়া দেওয়া
গাওয়ার জন্য আছে জোরালো এক কন্ঠস্বর—
শুধু আমি গাই 'প্যাক-প্যাক-প্যাক প্যাকর'।

এই কালো রূপসীটি গায় মিষ্টি সুরে
সুমধুর গান- শোনা যায় দূর থেকে দূরে;
কিন্তু তোমায় যেই না দেখে, সে চুপ হয়ে যায়
চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই
সে আকাশে মিলিয়ে যায়।



তোমাদের যত বার্তা বয়ে নিয়ে যাই আমি বহুদূর
উড়ে আবার ফিরেও আসি আমার পরিবারের কাছে;
ঝাঁকে ঝাঁকে আমরা শুধু থাকি চক্কর দিতে
কিংবা বসি মিনারের নিচে, শস্যদানা খেতে।

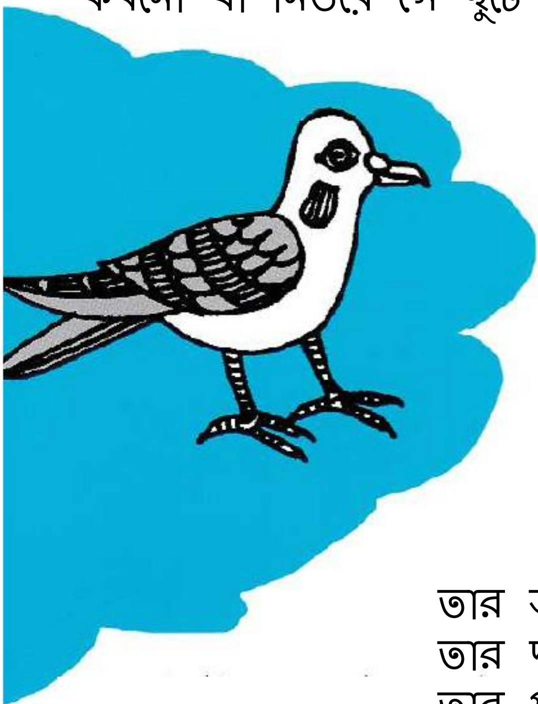


পাতা আর ঘাস কুড়িয়ে বেড়ায় খালি
কেবলই ওড়ে, বা ছোটে এদিক-সেদিক;
পরম যত্নে সে জড়ায় আর বোনে
ঘাস-পাতার সরু সরু আঁশগুলো টেনে—
বাসা গড়া হলে শেষ, ঢোকে লাফ দিয়ে গলে!

দেখো তাকে জলে দাঁড়িয়ে থাকতে—
ঠিক যেন নিশ্চল মূর্তি এক!
হঠাৎই সে বিদ্যুতের গতিতে ডুব দেয় জলে—
ঠোঁটে নিয়ে একটি মাছ উঠে আসে উপরে!



কী অপরূপ তার রূপ!
সবুজ শরীর, ঠোঁট দুটি যেন প্রবালের মতো লাল!
সে শান্ত হয়ে বসত করে গাঁয়ের মাঝে বসে,
কখনো বা নির্ভয়ে সে ছুটে বেড়ায় মাঠের ওপর এসে।



এই যে কালো পোশাক-পরা ইনি—
সারাদিন ধরে খাটেন অবিরাম;
তুমি যদি তাকে দুপুরের দাওয়াত দিলে—
'কা! কা! কা!'—
সে আসে পুরো সদলবলে!

তার আছে ধারালো ও বাঁকানো ঠোঁট,
তার দৃষ্টিশক্তি অতি প্রখর;
তার পালকগুলো শক্ত ও রুক্ষ,
শিকারের সন্ধানে সে চষে আকাশের বক্ষ।

কাক, ঈগল, ময়ূর, টিয়া, কোকিল, পায়রা, সারস,
মোরগ, পেঁচা, ময়না, উটপাখি, বাবুই পাখি, হাঁস

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi **Bengali** Suchandrima Chowdhury

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi **Artist** Uma Krishnaswamy

ছোট ঘোড়াটি ও নদী

অনেকদিন আগে একটি ছোট ঘোড়া তার মায়ের সাথে গাছপালায় ঘেরা এক সুন্দর উপত্যকায় বাস করত। ছোট ঘোড়াটি তার মাকে খুব ভালোবাসত। সে কখনোই তার মায়ের সঙ্গ ছাড়তে চাইত না! দিন হোক বা রাত—যখনই তারা একসাথে থাকত, সে তার মায়ের সাথে একদম লেপ্টে থাকত।

একদিন মা-ঘোড়াটি তার বাচ্চাটাকে খুব আদর করে বললেন, "আমার সোনাটা," তিনি বললেন, "তুমি তো আর এখন একদম বাচ্চা নও! তুমি কবে থেকে কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হবে?"

"আমি এখনই প্রস্তুত!" ছোট ঘোড়াটি বলল। "আমাকে বলো, আমাকে কী করতে হবে!" "খুব ভালো!" তার মা বললেন। তিনি পরম স্নেহে তার বাচ্চার মুখটি চেটে দিলেন।



"শস্যভর্তি এই বস্তাটি নিয়ে মিলে যাও, সেখানে এটি পিষে আটা তৈরি করা হবে।"

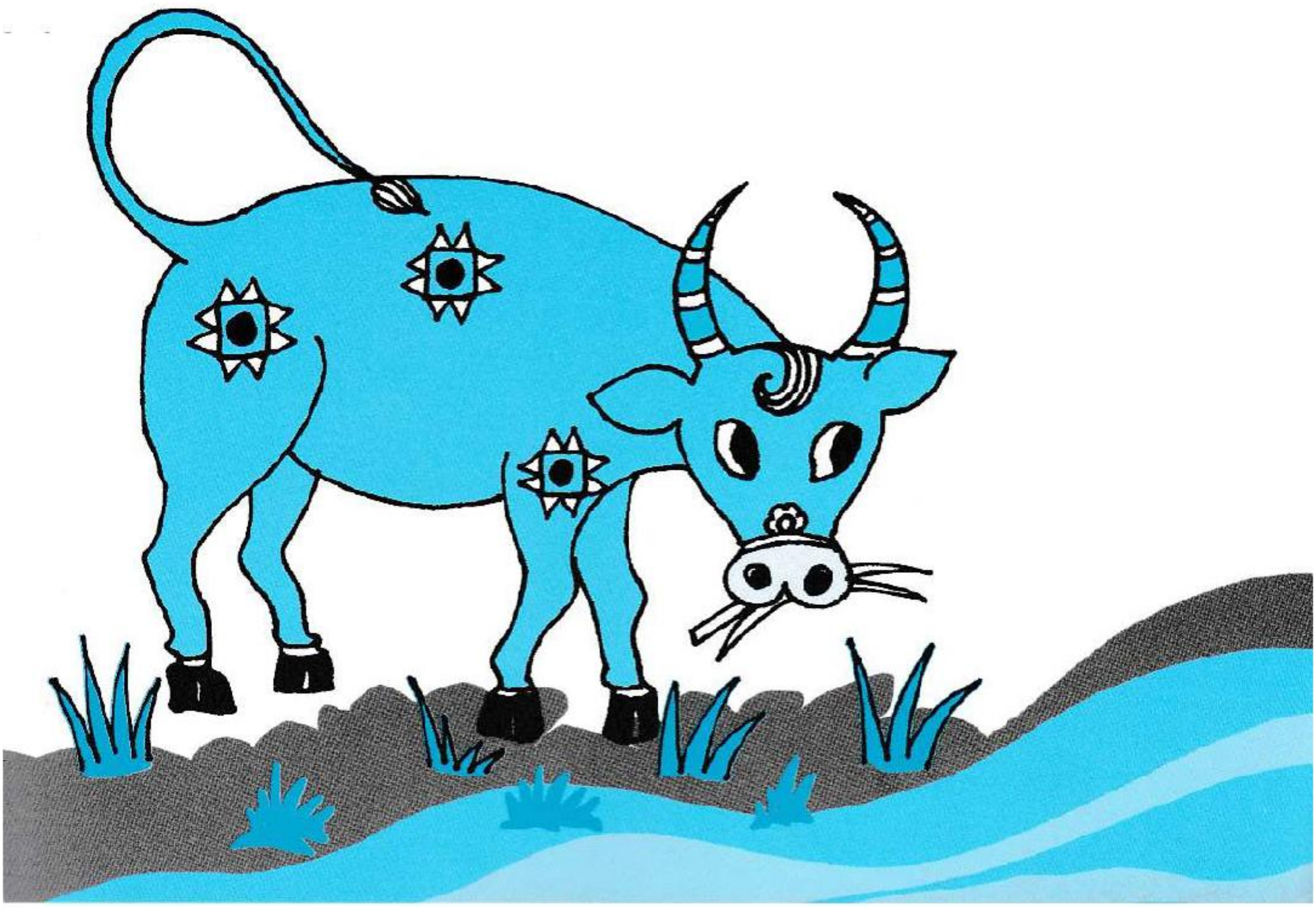
"আচ্ছা মা!" ছোট ঘোড়াটি বলল। বস্তাটি তার পিঠের ওপর তুলে দেওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর সে মিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কিন্তু হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। "ওহ, সর্বনাশ!" সে বলে উঠল। "এ আবার কী?"

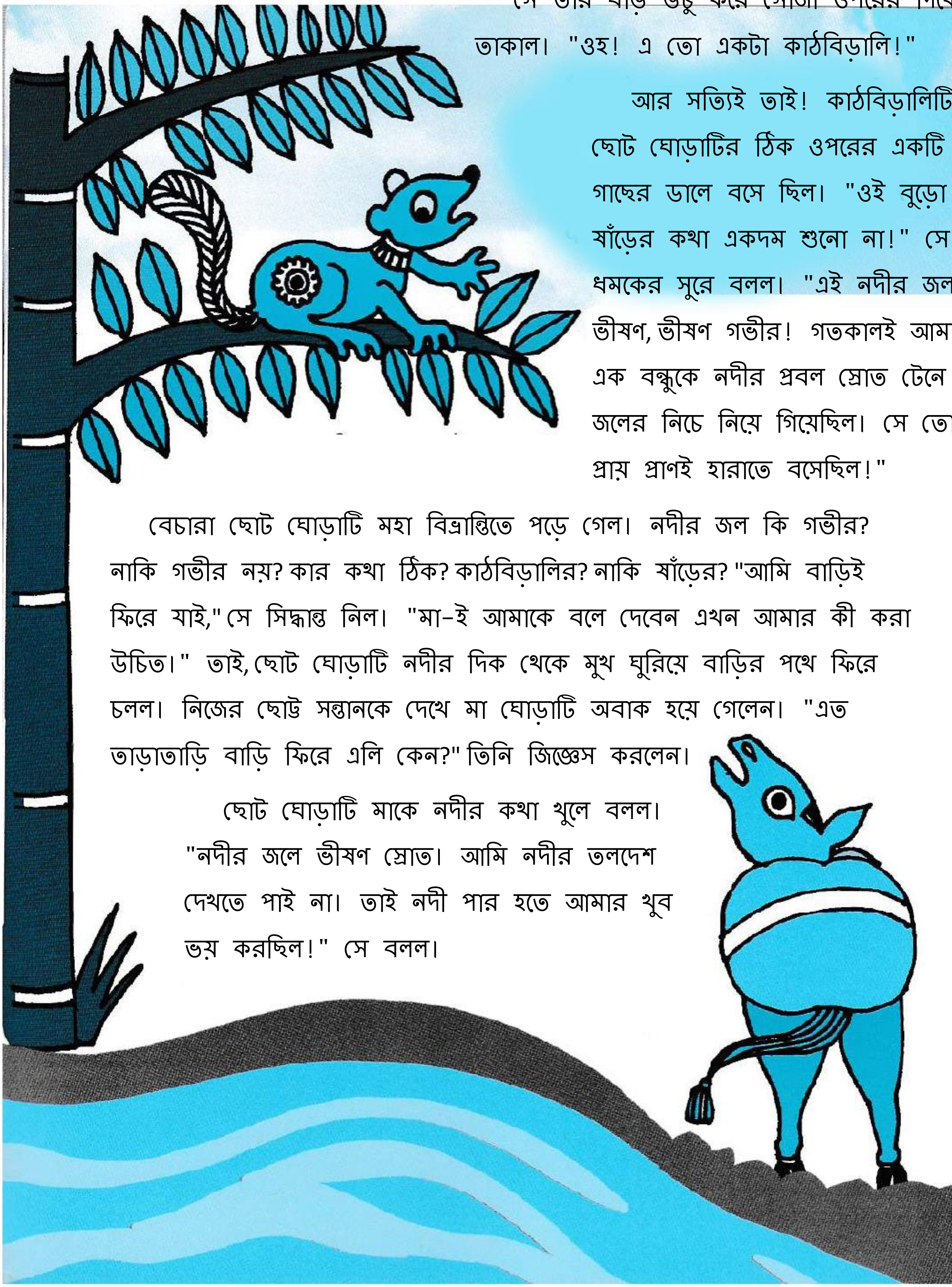
মিলের দিকে যাওয়ার পথটি একটি নদীর ওপর দিয়ে গেছে! ছোট ঘোড়াটি নদীর খরস্রোতা জলের দিকে তাকাল। "আমি কি নদীটি পার হতে পারব?" সে মনে মনে ভাবল।

কাছেই একটি ক্ষেতে একটি ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। "ষাঁড়মশাই! ষাঁড়মশাই!" ছোট ঘোড়াটি ডেকে উঠল। "দয়া করে আমাকে বলুন ষাঁড়মশাই, আমি কি এই নদীটি পার হতে পারব?"

"ভালো করে তাকিয়ে দেখো!" ষাঁড়টি বলল। "এই নদীর জল আমার হাঁটুর ওপরেও ওঠে না। তাহলে তোমার জন্য জল বেশি গভীর হবে কেন?" ছোট ঘোড়াটি সাহস সঞ্চয় করল। সে নদীর জলে পা রাখল। কিন্তু হঠাৎ একটি কন্ঠস্বর বলে উঠল, "দাঁড়াও! হুট করে কোনো কাজ কোরো না!"

"কে ওখানে?" ছোট ঘোড়াটি জিজ্ঞেস করল।





সে তার ঘাড় উঁচু করে সোজা ওপরের দিকে তাকাল। "ওহ! এ তো একটা কাঠবিড়ালি!"

আর সত্যিই তাই! কাঠবিড়ালিটি ছোট ঘোড়াটির ঠিক ওপরের একটি গাছের ডালে বসে ছিল। "ওই বুড়ো ষাঁড়ের কথা একদম শুনো না!" সে ধমকের সুরে বলল। "এই নদীর জল ভীষণ, ভীষণ গভীর! গতকালই আমার এক বন্ধুকে নদীর প্রবল স্রোত টেনে জলের নিচে নিয়ে গিয়েছিল। সে তো প্রায় প্রাণই হারাতে বসেছিল!"

বেচারা ছোট ঘোড়াটি মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। নদীর জল কি গভীর? নাকি গভীর নয়? কার কথা ঠিক? কাঠবিড়ালির? নাকি ষাঁড়ের? "আমি বাড়িই ফিরে যাই," সে সিদ্ধান্ত নিল। "মা-ই আমাকে বলে দেবেন এখন আমার কী করা উচিত।" তাই, ছোট ঘোড়াটি নদীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বাড়ির পথে ফিরে চলল। নিজের ছোট্ট সন্তানকে দেখে মা ঘোড়াটি অবাক হয়ে গেলেন। "এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলি কেন?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ছোট ঘোড়াটি মাকে নদীর কথা খুলে বলল। "নদীর জলে ভীষণ স্রোত। আমি নদীর তলদেশ দেখতে পাই না। তাই নদী পার হতে আমার খুব ভয় করছিল!" সে বলল।

"তাই নাকি?" মা ঘোড়াটি জিজ্ঞেস করলেন। "আমি তো রোজই যাই। আর সবসময়ই নিরাপদে ফিরে আসি।"

"হ্যাঁ মা। কিন্তু আমি তো বেশ গোলকধাঁধায় পড়ে গেছি," ছোট ঘোড়াটি বলল। "ষাঁড়মশাই আমাকে বললেন যে, নদীটা মোটেও গভীর নয়। জল নাকি বড়জোর তাঁর হাঁটু পর্যন্ত ওঠে। অথচ কাঠবিড়ালি আমাকে বলল যে, নদীটা নাকি ভীষণ গভীর। নদীর প্রবল স্রোত নাকি তার এক বন্ধুকে প্রায় ভাসিয়েই নিয়ে যাচ্ছিল। এখন আমি কী করব, মা?"

মা ঘোড়াটি মৃদু হাসলেন। "আমাকে বল তো বাছা—ষাঁড়টি লম্বায় কতটা? কাঠবিড়ালিটাই বা কতটা লম্বা? আর তুই-ই বা লম্বায় কতটা?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "এবার নিজে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নে। তুই কি নদীটা পার হতে পারবি?"

"ওঃ!" ছোট ঘোড়াটি বলে উঠল এবং আনন্দে লাফিয়ে উঠল। "এবার আমি বুঝতে পেরেছি! নদীটা মোটেও গভীর নয়! অন্তত আমার জন্য তো নয়ই!"

আর তারপর সে হাসিমুখে কলের পথের দিকে রওনা দিল।

চীনের একটি গল্পের অবলম্বনে



Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

আমাদের বিড়ালছানা



বানু আর ভেনুর একটি বিড়াল ছিল। তারা বিড়ালটিকে কতই না ভালোবাসত আর আদর-যত্ন করত! কিন্তু একদিন তাদের সেই প্রিয় বিড়ালটি হারিয়ে গেল। বানু আর ভেনু বিড়ালটির সব প্রিয় জায়গাগুলোতে খুঁজে দেখল। কিন্তু সে কোথাও ছিল না।

তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিনে... "মিউ, মিউ!"

"আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে?" বানু একটি মই নিয়ে উপরে উঠে চারপাশটা ভালো করে দেখল। আহা! "ও এই যে এখানে, ভেনু! আমাদের বিড়ালটা চিলেকোঠায় বসে আছে!" সে ডেকে বলল। "আর জানো কী? সাথে পাঁচ-পাঁচটা বিড়ালছানাও আছে! এসো, দেখে যাও!"

ভেনু মই বেয়ে উপরে উঠল। আর সেখানে দেখা গেল তাদের সেই বিড়ালটিকে—আর তার পাশে গা ঘেঁষে বসে ছিল তার বিড়ালছানাগুলো।



বানু আর ভেনুর গর্বের সীমা রইল না! তারা তাদের বাড়িতে আসা প্রতিটি দর্শনার্থী আর অতিথিকে বিড়ালছানাগুলো দেখাত। সবাই সেগুলো দেখে খুব খুশি হতো!

বিড়ালছানাগুলো খুব দ্রুত বড় হতে লাগল। তারা সারা বাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াত। তারা খেলা করত আর নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করত। তারা একে অপরের ওপর চড়ে পাহাড়ের মত হয়ে থাকত। তারা হাঁড়ি-পাতিলের ভেতরে লুকিয়ে পড়ত আর গড়াগড়ি খেত।

একদিন বানুর মা বলে উঠলেন, "এই বাড়িতে বড্ড বেশি বিড়ালছানা হয়ে গেছে!" এরপর তিনি বানু আর ভেনুকে বললেন, তাদের নিজেদের জন্য কেবল একটি বিড়ালছানা বেছে নিতে এবং বাকিগুলো অন্যদের দিয়ে দিতে। মন ভেঙে গেলেও, তারা চারটি বিড়ালছানা তাদের বন্ধুদের দিয়ে দিল। নিজেদের জন্য তারা কেবল একটি ধূসর রঙের বিড়ালছানা রেখে দিল।

তারা সেই বিড়ালছানাটিকে কতই না আদর করত! তারা তাকে নিয়মিত খেতে দিত এবং পান করার জন্য সবসময় পরিষ্কার জল রেখে দিত। তারা ঘন্টার পর ঘন্টা তার সাথে খেলা করত। এমনকি রাতে ঘুমানোর সময়ও তারা তাকে নিজেদের বিছানায় নিয়ে যেত।

একবার বানু আর ভেনু সেই ধূসর বিড়ালছানাটিকে নিয়ে খড়ের গাদায় ভরা একটি মাঠে খেলতে গেল। সোনালি রঙের খড়গুলো সেখানে উঁচু হয়ে স্তূপ করে রাখা ছিল। খড়ের আলগা আঁশগুলো মৃদু বাতাসে দুলছিল।

তারা যখন বিড়ালছানাটিকে মাটিতে নামিয়ে দিল, তখন সে গুটিসুটি মেরে মাটির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে এগোতে লাগল। এই নতুন জায়গায় না জানি কী বিপদ অপেক্ষা করছে! তবে শীঘ্রই সে খেলা শুরু করে দিল। সে লাফ দিয়ে খড়ের গাদার ওপর উঠে গেল এবং সেখান থেকে পিছলে নিচে নেমে এল।

সে তার থাবা দিয়ে খড়ের একটি আঁশ আঁকড়ে ধরল এবং সেটা নিয়ে খেলা করতে লাগল। নিজেদের বিড়ালছানাটিকে এভাবে আনন্দে মেতে উঠতে দেখে বাচ্চাগুলো হাসতে লাগল। আরও অনেক বাচ্চা সেখানে ছুটে এল সেই দৃশ্য দেখতে আর হাসাহাসি করতে। এরপর তারা সবাই মিলে খেলা শুরু করে দিল।

তারা কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল? না! তবে ততক্ষণে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিড়ালছানাটি কোথায়? বাচ্চাগুলো তাকে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। কিন্তু সেই ধূসর রঙের বিড়ালছানাটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

বানু আর ভেনু কান্না কিছুতেই থামাতে পারছিল না। "আহা, বেচারা কিটি!"—তারা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কে তাকে খেতে দেবে, দুধ খাওয়াবে? সে কোথায় ঘুমাবে? কীভাবে সে শীত থেকে বাঁচবে? বাড়িতে ফিরে তাদের মন থেকে এই প্রশ্নগুলো একের পর এক বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের মা তাদের শান্ত করে বললেন, "তোমাদের বিড়ালছানাটি ঠিকই নিজের পথ খুঁজে ফিরে আসবে!"



বাচ্চারা সন্ধ্যার পড়াশোনার জন্য তাদের বই নিয়ে বসল। কিন্তু তাদের মন পড়ে রইল সেই ছোট্ট ধূসর বিড়ালছানাটির কাছেই।

হঠাৎই ঘরের এক কোণে, মেঝের ওপর দিয়ে একটি টুপি নড়তে শুরু করল। "ওরে বাবা, বাঁচাও! একটা টুপি হেঁটে যাচ্ছে!"—বানু চিৎকার করে উঠল। সে আর ভেনু দৌড়ে তাদের মায়ের কাছে গেল। তিনজন মিলে সেই টুপিটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তখন তাদের মা মুচকি হাসলেন।

"ওটা কী? টুপির আড়ালে আমি তো ধূসর রঙের কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি!"—তিনি বললেন। একটি ধূসর লেজের আগা আলতোভাবে এদিক-ওদিক নড়ছিল। "ওহ! ওটা তো আমাদের কিটি!"—বানু বলে উঠল। সে দৌড়ে বিড়ালছানাটির কাছে গেল এবং খুব সাবধানে টুপিটি তুলে ধরল। সে বিড়ালছানাটিকে কোলে তুলে নিল এবং আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরল।

"তুমি কি এতক্ষণ এখানেই লুকিয়ে ছিলে?"—সে আদুরে গলায় বলল। তারপর একটু বকুনি দিয়ে বলল, "জানো, আমরা তোমাকে কত খুঁজেছি!" ভেনু আলতো করে বানুর কাছ থেকে বিড়ালছানাটিকে নিজের কোলে তুলে নিল। সে বিড়ালছানাটিকে নিজের খুব কাছে ধরে ফিসফিস করে বলল, "আমি খুব খুশি যে তুমি হারিয়ে যাওনি!"



রাশিয়ার একটি গল্পের অবলম্বনে রচিত

P. Saraswati V. Vijayakanthi
L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation
Bengali Suchandrima Chowdhury
Artist Uma Krishnaswamy

জাদুর ঢোল

অনেক কাল আগের কথা, জাপানে জেঙ্কোরা নামের এক বালক বাস করত। জেঙ্কোরার কাছে ছিল একটি জাদুর ঢোল।

যখন সে ঢোলের এক পাশে আঘাত করে বলত, "লম্বা নাক, লম্বা নাক!", তখন তার নাক লম্বা হয়ে যেত। আর যখন সে ঢোলের অন্য পাশে আঘাত করে বলত, "ছোট নাক, ছোট নাক!", তখন তার নাক ছোট হয়ে যেত।

অনেকেই তাদের নাক পরিবর্তন করার আশায় জেঙ্কোরার কাছে আসত। আর সেও সানন্দে তাদের সাহায্য করত।

কেউ যদি লম্বা নাক চাইত, তবে সে ঢোলের সেই পাশে আঘাত করত এবং মন্ত্রের মতো আওড়াত, "লম্বা নাক, লম্বা নাক!" আর কেউ যদি ছোট নাক চাইত, তবে সে ঢোলের অন্য পাশে আঘাত করত এবং আওড়াত, "ছোট নাক, ছোট নাক!" সে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢোল বাজাতে ও মন্ত্র আওড়াতে থাকত, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি বলে উঠত, "থামাও!"



মাঝে মাঝে কেউ কেউ "থামাও!" বলতে ভুলে যেত। তখন জেঙ্কোরা—যে ছিল এক চঞ্চল বালক!—ঢোল বাজানো চালিয়েই যেত। একবার তো একজনের নাক ঢোলের কাঠির চেয়েও বেশি লম্বা হয়ে গিয়েছিল!

একদিন জেঙ্কোরা ভাবল, "আমার নাক কতদূর পর্যন্ত লম্বা হতে পারে?" এই ভেবে সে ঢোলের এক পাশে আঘাত করতে করতে বলতে শুরু করল, "লম্বা নাক, লম্বা নাক!" দেখতে দেখতেই তার নাক তার হাতের সমান লম্বা হয়ে গেল!

জেঙ্কোরাকে থামানোর আর কোনো উপায় ছিল না। সে মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং ঢোল বাজিয়েই চলল। "লম্বা নাক, লম্বা নাক!" তার নাক বাড়তে বাড়তে একটি গাছের সমান উঁচু হয়ে গেল।

"লম্বা নাক, লম্বা নাক!" তার নাক পাহাড়-পর্বতের চেয়েও উঁচু হয়ে গেল।

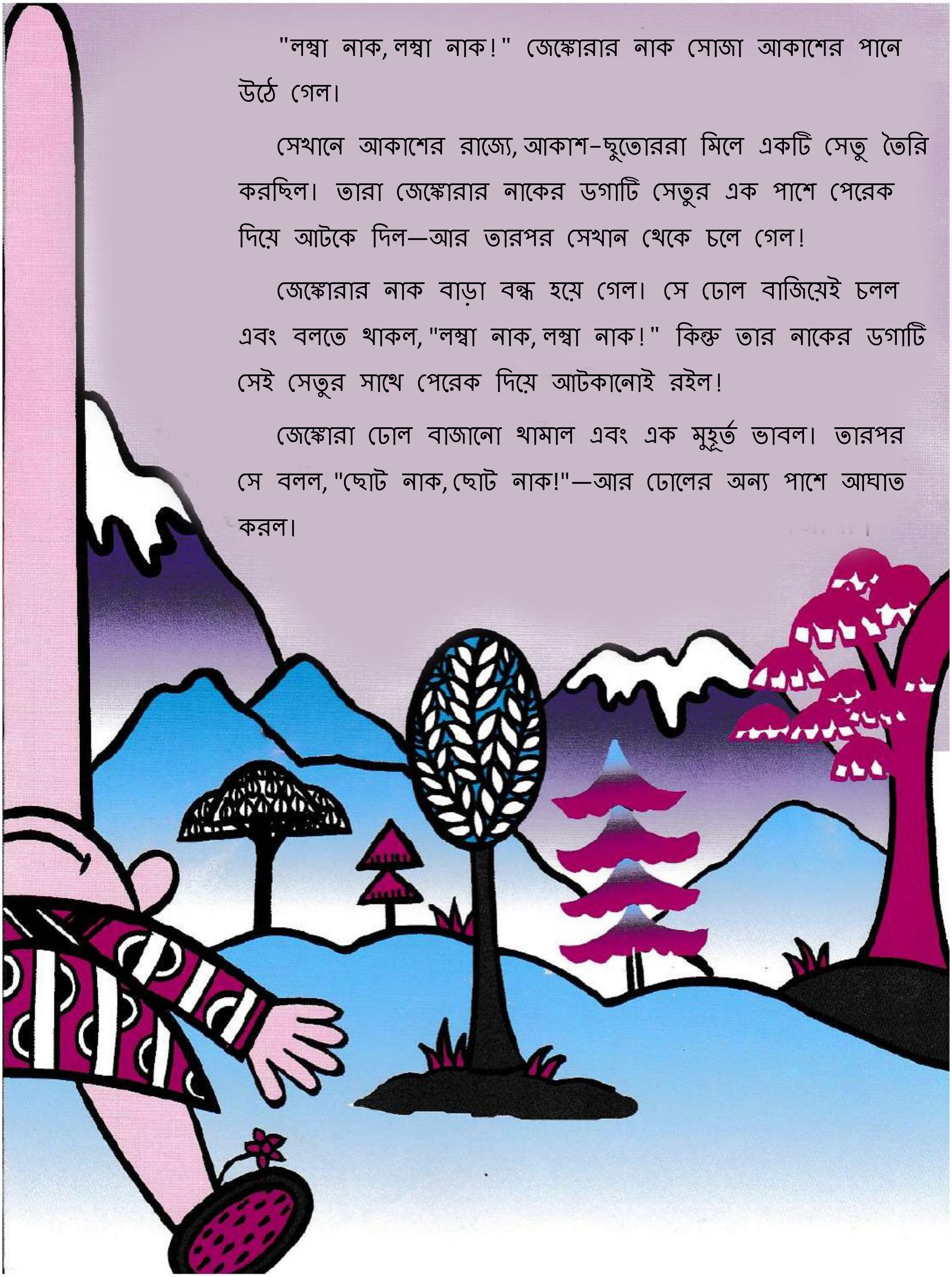


"লম্বা নাক, লম্বা নাক!" জেঙ্কোরার নাক সোজা আকাশের পানে উঠে গেল।

সেখানে আকাশের রাজ্যে, আকাশ-ছুতোররা মিলে একটি সেতু তৈরি করছিল। তারা জেঙ্কোরার নাকের ডগাটি সেতুর এক পাশে পেরেক দিয়ে আটকে দিল—আর তারপর সেখান থেকে চলে গেল!

জেঙ্কোরার নাক বাড়া বন্ধ হয়ে গেল। সে ঢোল বাজিয়েই চলল এবং বলতে থাকল, "লম্বা নাক, লম্বা নাক!" কিন্তু তার নাকের ডগাটি সেই সেতুর সাথে পেরেক দিয়ে আটকানোই রইল!

জেঙ্কোরা ঢোল বাজানো থামাল এবং এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর সে বলল, "ছোট নাক, ছোট নাক!"—আর ঢোলের অন্য পাশে আঘাত করল।



এবার তার নাক ছোট হতে শুরু করল। কিন্তু নাকের ডগাটি তো আর নিচে নেমে এল না! জেঙ্কোরা এবং তার ঢোলটি ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উপরে উঠে যেতে লাগল!

অবশেষে জেঙ্কোরা সেই আকাশ-সেতুটির কাছে গিয়ে পৌঁছাল। সে তার নাক থেকে পেরেকটি সজোরে টেনে বের করে আনল। মুহূর্তের জন্য সে যেন শূন্যে ভেসে রইল... তারপরই সে নিচে পড়তে শুরু করল—আকাশ ফুঁড়ে, পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে, গাছপালা পেছনে ফেলে...

আকাশ-সেতুটির ঠিক নিচেই ছিল একটি মাছের পুকুর। ঝপাং! জেঙ্কোরা সেই পুকুরে গিয়ে পড়ল। সে একেবারে তলদেশে ডুবে গেল। তার চারপাশ ঘিরে ছিল নানা রঙের ঝলমলে মাছেরা। কৌতূহলবশত তারা সাঁতরে তার খুব কাছে চলে এল।

জেঙ্কোরার হাত থেকে তার ঢোলটি খসে পড়ল। তার শরীরের রূপ বদলে যাচ্ছিল! তার দুই হাত রূপান্তরিত হলো পাখনায়! তার দুই পা জোড়া লেগে তৈরি হলো একটি লেজ! এরপর সে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

আজও সেই পুকুরের মাছগুলোকে "জেঙ্কোরা মাছ" নামেই ডাকা হয়।

একটি জাপানি লোককথা



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy

40

কবি এজুমালাই

এজুমালাই বাস করত কল্পনার এক জগতে। সে জানালার পাশে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকত। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, "কী করছ এজুমালাই?" সে কবিতার ছন্দে উত্তর দিত:

দেখো, প্রজাপতিটা কেমন উড়ে গেল!

ইঁদুরের দল প্রায়ই ছোটে—তবে কি শুধুই মজার জন্য?

অন্য ছেলেরা তাকে খেপাত। তাকে দেখলেই তারা চেঁচিয়ে উঠত, "ওই আসছে কবি এজুমালাই!" কিন্তু শব্দের জাদুতে ছবি আঁকতে সে কখনোই ক্লান্ত হতো না।



একদিন এজুমালাই তার দিদিমার বাড়ি বেড়াতে গেল। পথের দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাছপালা, বাগান আর পাখিরা... আহা! কী অপূর্ব সুন্দর!

সে একটা তালগাছের পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই সে গেয়ে উঠল—

লম্বা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে—ট্রা-লা!

সে আরও এগিয়ে চলল। ওহ! ওখানে তো একটা পেঁচা! এজুমালাই গেয়ে উঠল—

বড় বড় চোখ মেলে পেঁচাটা তাকিয়ে আছে—ট্রা-লা!

হঠাৎ সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে গেয়ে চলল—

লম্বা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে—ট্রা-লা! বড় বড় চোখ মেলে পেঁচাটা তাকিয়ে আছে—ট্রা-লা!

আরও কিছুটা এগিয়ে সে দেখল একটা কুকুর মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। ওটাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো বুনো জন্তু—একটা শেয়াল!



চতুর শেয়াল গর্ত খুঁড়ছে—ট্রা-লা, ট্রা-লা!

কী এক অলৌকিক ব্যাপার! এজুমালাইয়ের মুখ থেকে কবিতার পঙক্তিগুলো যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসছিল।

লম্বা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে—ট্রা-লা!

বড় বড় চোখ মেলে পেঁচাটা তাকিয়ে আছে—ট্রা-লা!

চতুর শেয়াল গর্ত খুঁড়ছে—ট্রা-লা, ট্রা-লা!

সে হাঁটছিল আর গাইছিল। অবশেষে সে তার দিদিমার গ্রামে এসে পৌঁছাল।

রাত নেমে এসেছে। গ্রামটি তখন নিস্তব্ধ। ওহ, একী! তার দিদিমার বাড়িতে তালা ঝুলছে, বাড়িটা একদম ফাঁকা! এজুমালাই চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু এখন কী করা যায়? অপেক্ষা করার মতো একটা জায়গার খোঁজে সে চারদিকে তাকাল।



কাছেই একটা বাড়ি ছিল, যার সামনে বেশ বড় একটা বারান্দা। এজুমালাই সেই বাড়ির প্রবেশপথের পাশে শুয়ে পড়ল। সে চোখ বুজল...

...আর হঠাৎই চমকে জেগে উঠল! ওটা কিসের শব্দ?!

সে জানালার শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল এবং দেখতে পেল দুটি লম্বা পা! ঘুমের ঘোরে বিভ্রান্ত হয়ে সে ভাবল—ওগুলো বুঝি তালগাছ! তাই সে গেয়ে উঠল—

উঁচু তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে—ট্রা-লা!

চোরটি গানের সুর শুনতে পেল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে লাগল, কিন্তু গায়ককে দেখতে পেল না।

এঝুমালাই, আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছিল; সে গেয়ে উঠল—

বড়-বড় চোখ মেলে পেঁচা তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে—ট্রা-লা!

"কেউ একজন এদিকেই আসছে!" চোরটি মনে মনে ভাবল। "আমার উচিত হবে লুট করা জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলা!" সে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল এবং মাটিতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল।

এঝুমালাই তখন গেয়ে উঠল—

চতুর শেয়াল গর্ত খুঁড়ছে, গর্ত খুঁড়ছে—ট্রা-লা, ট্রা-লা!

চোরটি ভয়ে জমে গেল! সে পাগলের মতো এদিক–ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর সে তার যন্ত্রপাতি ও লুট করা জিনিসপত্র ফেলে রেখেই সেখান থেকে দৌড়ে পালাল!

ঠিক তখনই এঝুমালাই চিৎকার করে উঠল, "চোর! চোর!" লোকজন দৌড়ে সেখানে ছুটে এল। তারা চোরের ফেলে যাওয়া যন্ত্রপাতি ও লুট করা জিনিসগুলো দেখতে পেল। কী ঘটেছে, তা বুঝতে তাদের বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। তারা এঝুমালাইয়ের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। "তুমি আমাদের সবাইকে রক্ষা করেছ! হুররে! হুররে!"

সেই দিন থেকে, সবাই এঝুমালাইয়ের কবিতা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত।

তামিলনাড়ুর একটি লোককথা



© Katha Jharna 2008

P. Saraswati V. Vijayakanthi

L. S. Saraswathi S. Rajalakshmi

Publisher Rajalakshmi Srinivasan Memorial Foundation

Bengali Suchandrima Chowdhury

Artist Uma Krishnaswamy